পরিবর্তনের রাজনীতি — রাজনীতির পরিবর্তন

গৌরীশঙ্কর দত্ত

বাঙালির জীবনে রাজনীতির স্থানটা কোথায় কিম্বা বাঙালি সমাজের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্কটাই বা কেমন, এটা নিয়ে বাংলা মুলুকে দীর্ঘদিন ধরে একটা বিতর্ক চলে আসছে। বহুচর্চিত এই প্রশ্নগুলো আজও সমানভাবেই বিতর্ক উসকে দেয়। কারোর মতে রাজনীতির রাহুগ্রাস বাঙালি সমাজকে পঙ্গুকরে রেখেছে, আবার কেউবা বলেন, রাজনীতির প্রবল উপস্থিতিই বাঙালি সমাজজীবনকে সচল ও বর্ণময় করে রাখতে পেরেছে! দুটি ভাবনাই মতের আঙ্গিনায় বিপরীতমুখী দুই মেরুতে অবস্থিত। রাজনীতির যে ব্যবহারিক দিকটা আমাদের পরিচিত, সেটি আবর্তিত হয় ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে। একে বলা যেতে পারে ক্ষমতাতন্ত্র। সাধারণ মনুষ যার আঁচ পায় ক্ষমতাশালীর ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশের নিরূপায় দর্শক হয়ে। ক্ষমতায় আসীন এই ক্ষমতটা ধরে রাখার জন্য অবিরত তৈরি করে চলে মোটা ও সুক্ষ্ম দাগের নানা মারপ্যাঁচ। যাতে বিরোধীপক্ষ ক্ষমতার চৌহদির ধারেকাছেনা ভিড়তে পারে, তার জন্য শাসক সৃষ্টি করে হাজারও কিসিমের প্যাচপয়জার। আর শাসকে নাজেহাল করার লক্ষ্যে বিরোধীশিবির অবলম্বন করে নানা ফন্দিফিকির ও কুটকৌশল। এর থেকে জন্ম নেয় ভীতি ও সন্ত্রাসের আবহে স্তাবকতা ও বশ্যতার রাজনীতি, যা আড়াআড়িভাবে বিভক্ত করে দেয় সমাজটাকে, যে আমরা-ওরার স্পষ্ট বিভাজন আমরা দেখেছি বিগত সাড়ে তিন দশকে। তথাকথিত শ্রেণিবিভাজন থেকে এটি অনেক বেশি প্রকট। আধুনিক বিশ্বের অন্যতম পুরোধা চিন্তাবিদ মিশেল ফুকোর কথায় - আমি দুটি বিকারগ্রস্ত নমুনার কথা উল্লেখ করব - সেই দুটি ক্ষমতার অসুখ হল ফ্যাসিবাদ এবং স্তালিনবাদ। এগুলিকে ধাঁধা মনে করার অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি হল, তাদের ঐতিহাসিক অভিনবত্ব থাকা সত্ত্বেও, তারা যথেষ্ট মৌলিক নয়। অন্য সমাজে আগেই যে সমস্ত কারিগরি প্রচলিত ছিল তাকেই তারা প্রসারিত করেছে। এছাড়া তাদের অন্তর্নিহিত পাগলামি সত্ত্বেও তারা অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের রাজনৈতিক যুক্তিবাদের তত্ত্ব ও কৌশল ব্যবহার করেছে। রাজনৈতিক প্রতাপের যৌক্তিকতা এবং বাড়াবাড়ির সম্পর্কটা খুব স্পষ্ট। তার এই সম্পর্কের অস্তিত্বকে চিহ্নিত করার জন্য আমাদের কোনো বুরোক্রাসি বা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। সংসদীয় গণতন্ত্রের সাংবিধানিক কাঠামোতে নির্বাচনের প্রচলিত পদ্ধতিতে হাইজ্যাক করে ৩৪ বছর ধরে স্তালিনবাদের আলিমুদ্দিনীয় মডেলে ক্ষমতার আধিপত্য আমাদের নিবাসভূমি পশ্চিমবঙ্গেই নির্বিবাদে কায়েম থেকেছে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের বর্শামুখ হিসাবে মমতার আবির্ভাবের প্রাকমুহূর্ত পর্যন্ত। সমাজবিজ্ঞান সমস্ত যুক্তি ও গণতন্ত্রের সব রুপকল্পকে একরকম অগ্রাহ্য করেই ১৯৭৭ থেকে ২০১১- ৩৪টা বছর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পটচিত্র ভীষণরকমের একমাত্রিক ও একরৈখিকে ফলিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষা এই স্থাবর পরিস্থতিকে স্থিতাবস্থার পঙ্গুত্ব ছাড়া আর কিছু বলে অভিহিত করা যায় কি?

জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে ইন্দিরা গান্ধির সরকার। জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃতে ভারত জুড়েই কংগ্রেসের দিল্লিস্থ বংশানুক্রমিক ক্ষমতাকেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের লড়াই তরঙ্গায়িত হয়েছে। ৭৭-র নির্বাচন। গণরায়ে ভারত শাসনের অধিকার হারাল কংপ্রেস। ইন্দিরা গান্ধিও পরাজিত হলেন। ইন্দিরা গান্ধি ও সিদ্ধার্থরায়ের দেশ শাসনের প্রকরণ ণাগরিকমানসে স্বৈরতান্ত্রিক বলে অনুভুত হলেও ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ ওই ক্ষমতার দাপটের বিরুদ্ধে কোণো প্রতিবাদ সংগঠিত না করলেও জয়প্রকাশ নারায়ণের জরুরিঅবস্থা-বিরোধী আন্দোলনের প্রতি মানুষের ,স্বত:স্ফূর্ত সমর্থনে গা ভাসিয়ে জয়প্রকাশ ধারার প্রফুল্ল সেনদের পিছনের সারিতে পাঠিয়ে নিজের শক্তিশালী সংগঠনকে হাতিয়ার করে ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদটাকে হাইজ্যাক। করে ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করল সিপিএম। এবং ক্ষমতাররূঢ়

হয়ে সমাজের প্রতিটি ধমনীতেই নিজের লোক (যা স্তালিনের নুমেনক্লাতুরা সিস্টেম বলে চিহ্নিত) নিযুক্ত করে গোটা সমাজেই আধিপত্য কায়েম করে বসল। সাধারণ গৃহস্থকে নেতা নির্ভর- প্রশাষসন নির্ভর করে ফেলার মাধ্যমে বাংলায় দলতান্ত্রিক শাসনের এক নতুন সুচণা হল, যেখানে মেহনতি মানুষের সংখ্যাগরিষ্ট অংশের জীবন জীবিকার ওপর চুড়ান্ত পার্টি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হল। সরকারি-আধা সরকার-বেসরকারি সব সংগঠনেই (সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমেত) পরিকল্পিত দলীয় অনুপ্রবেশ ও দখলদারি কায়েম করে দলীয় ব্যবস্থার প্রলম্বিত শাখা বানিয়ে ফেলা হল। গ্রামগুলিতে ও মফস্বল শহরগুলোয় প্রশাসনিক ও দলীর শক্তির সমন্বিত প্রয়োগে তৈরি লে ভয়ের পাঁচিল যেটি পেরিয়ে বিরোধী হাওয়া ঢোকা হয়ে উঠল প্রায় অসম্ভব। ৩৪বছর ধরে আলিমুদ্দিন ও মহাকরণের যৌথ সিম্ফনিতে সৃষ্টি হল এমন এক একরৈখিকতার ভাবণা, যা মন্যতা দেয় ণা কোনও ধরণের ভিন্নতাকে, স্বীকার করে না ভিন্ন কোনো স্বরকে।

১৯৭৭-এ যা ছিল গণসমর্থনের গণজোয়ার, ১৯৮২- র পর সেটিকে রূপান্তরিত করা হল সংসদীয় গণতন্ত্রের মোড়কে একদলীয় শাসনযন্ত্রে। তবু বামফ্রন্টের প্রথম দফাগুলোয় নেতামন্ত্রীরা ক্ষমতার ভাষা পুরোপুরি রপ্ত করতে পারেননি। মাটির গন্ধ তখনও তাদের গায়ে একটু-আধটু লেগে ছিল। পক্ষান্তরে ক্ষমতাচ্যুত কংগ্রেসি নেতাপান্ডারা ক্ষমতার ভাষার অভ্যাসটা ছাড়তে পারেননি। ফলে বিরোধীদল হিসাবে কংগ্রেস মানুষের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করতে পারেনি। বরং দিল্লি আমাদের দখলে, সেইসুত্রে কলকাতাতেও আমরা তলেবর- এই মানসিবতা কংপ্রেসকে পশ্চিমবঙ্গো বামফ্রন্টের বিকল্প হিসাবে বিশ্বাসযোগ্য করেনি। আবার এদের ক্ষমতালিপ্সা এদেরকে শাসক সিপিএমের সঙ্গো কনশেসনরূপ উচ্ছিষ্ঠ ও লুঠেমারের ভাগযোগের গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ করে ফেলল। ফলে সিপিএমের সামনে রইল না কোনো প্রতিবন্ধক। যতক্ষণ না নব্বইয়ের দশকে পরবর্তী প্রজন্মের কংগ্রেস নেতারা উঠে এলেন। এদের পুরোভাগে মমতা ব্যানার্জি কংগ্রেসের হয়ে ক্ষমতার অলিন্দে পা রাখেননি আগে। তাই এদের ভাষাটা ছিল লড়াইয়ের, ক্ষমতার নয়। মানুষ এদের বিশ্বাস করল। সিপিএমও বুঝল আমারে বধিবে যে - গোকুলে বাড়িছে সে। গণতন্ত্রের সব ছদ্ম- আবরণ সরিয়ে ফেলল সিপিএম। শুরু হল দলীয় পেশিপ্রদর্শন বা হার্মাদতন্ত্রের প্যারেড এবং প্রশাসনিক দমনপীড়নের স্তালিনবাদী মডেল। রুজুকরা হল বংলা জুড়ে হাড় হিম করা সন্ত্রাসের আবহা। দম বন্ধ করা সন্ত্রাসের ভয়াল পরিবেশ অনুষ্ঠিত হতে লাগল ভোট। কৃত্রিম গণরায়ে আয়ু বেড়েই চলল সিপিএম রাজত্বের। আর ভেজাল মিশ্রিত গণরায়ে কতটা ভেজাল আছে তার গভীরে না গিয়ে আত্মপ্রসাদের ঢেকুর তোলায় ব্যস্ত রইলেন বামনেতৃত্ব। ফলে মানুষের সঙ্গো যোগাযোগটাই হারিয়ে ফেলল সিপিএম। ধান্দাবাজরাই হয়ে রইল পার্টি আপারচিকে। পক্ষান্তরে ক্ষমতার কংপ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে ক্ষমতার চৌহদ্দির বাইরে তৃনুমূল কংগ্রেস তৈরি করলেন মমতা। মানুষ কণ্ঠ পেল তার আপত্তি-প্রতিবাদ জানানোর। খুজে পেল প্রতিরোধের প্লাটফর্ম। সবচেয়ে বরো কথা ভয়ের য়ে সামগ্রিক তমিস্রা বাঙালি সমাজকে আচ্ছন্ন করে রেখোছিল এতদিন, সেখানে সিঁধোতে শুরু করল ভয়ভাঙানির মন্ত্র। না দিল্লির বংশানুক্রমিক প্রাসাদের অন্তঃপুরে থেকে এ সুর ভেসে এল ন। বাঙালি সবিস্ময়ে দেখল ভয়ভাঙানির ডাক দিচ্ছে তার পাশের বাড়ির এক আটপৌরে মেয়ে । তার নিজের মতোই একজন। তার নাম মমতা। তাকে সে বিশ্বাস করল। ভয় ভাঙল পশ্চিমবঙ্গাবাসীর। বরাভয় মনুষ বুকবেঁধে পথে নামল হার্মাদতন্ত্রের অবসানের লক্ষ্মে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের পর ঘটল যেন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। বাংলার রাস্তায় যেন পুনরায় নেমে এল ১৯৪২। দল ও সরকারের পীড়ণের দেওয়াল বার্লিনওয়াল-এর মতেই ভেঙে পড়ল জনরোষে। মানুষের উৎসবের মতো করেই পুন:প্রতিষ্ঠা করতে চাইল গণতন্ত্রকে, উৎখাত করতে। চাইল আলিমূদ্দিনতন্ত্রকে। আর এইভাঙা ও গড়ার উৎসবে ঝড়িক ঋত্বিক হিসাবে মানুষ বেছে নিল একজনকেই- মমতাকে। বুপুর ডাকে সব ভেদাভেদ ভুলে আন্দোলনে ভারতবাসীর সামিল হওয়ার গ্রন্থনা করতে বহুকাল আগে জাতির পিতার উদ্দেশে গান বেঁধেছিল কাজী

নজরুল - কোন পাগল পথিক ছুটে এল / বন্দিনী মার আঙিনায় / ত্রিশ কোটি লোক সকল ভুলে / গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায়। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-নেতইয়ের লড়াইরত মানুষ ভয় ভাঙানির ডাক শুনল মমতারই কণ্ঠে। বা প্রতিবাদের দীপশিখা হয়ে উঠল দাবানল। এল পরিবর্তন। শুরু হল বাংলা পরিবর্তিত জামানা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন -প্রভুত্ব জিনিষটা একটা ভার, মানুষের সহজ চলাচলের পথে একট বাধা। ...বোঝা নামইয়া ফেলিতে না পারি, অন্তত বোঝা সরাইতে না পারিলে বাঁচি না। পাল্কির বেহারা তই বারবার কাঁধ বদল করে। মানুষের সমাজকেও এই প্রভুতের বোঝা লইয়া বারবার কাঁধ বদল করিতে হয় - কেননা তাহা তাহাকে বাহির হইতে চাপ দেয়। বাংলায় ৩৪বছর ধরে বোঝাটা কাঁধের ওপর চেপে বসেছিল। মমতার দেখানো দিশায় বাঙালি বোঝা সরাতে পারল। পবিবর্তন ঘটল। না পরিবর্তন - এখানেই শেষ হয়নি। পশ্চিমবঙ্গো ক্ষমতায় এল যে সরকার, তার পরিচয় তৃনমূলের সরকার নয়, মা-মাটি-মানুষের সরকারা। নামকরণেই দেখা গেল ক্ষমতার কেন্দ্র ও বৃত্তকে অতিক্রম করার একটা আন্তরিক প্রয়াস। ক্ষমতার পিঠে বসে ক্ষমতাকে অস্বীকার করার দুরন্ত লড়াইটা শুরু হয়েছে। কাজটা সহজ নয়।

আজকের দুনিয়ায় রাষ্ট্রশক্তির অতিবৃদ্ধি যতটা সত্যি, ঠিক ততটাই সত্যি বাজারের অতিরিক্ত প্রসার। একদিকে যেমন অস্ত্রসম্ভার উৎপাদন বাড়ছে। যার ক্রেতা রাষ্ট্র বা সরকার। ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বাড়ছে আরও দ্রুতগতিতে। এর বিক্রির জন্য বাড়ছে প্রচার ও বিজ্ঞাপন। ভোক্তাসমাজে তৈরি হচ্ছে কৃত্রিম চাহিদা। ঘটছে ব্যয়াধিক্য। সৃষ্টি হচ্ছে অতিরিক্ত অর্থের চাহিদা। লোভ ও দূর্নতী চলছে হাতে হাত মিলিয়ে, বাসা বাঁধছে সর্বত্র। অদ্ভুতভাবে মুক্তঅর্থনীতির কারবারিরা রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রীভবনে বাধা তো দেইনা বরং করেন নিষ্ক্রিয় সমর্থন। এরা চান উৎকোচের সিঙ্গাল ডোর ব্যবস্থা। তাতে মুনাফা বাড়ে। সেকারনেই সোভিয়েয়ের অবলুপ্তির পর-ও তথাকথিত কমিউনিস্ট শাসন পশ্চিমবঙ্গো চলতে পারল। বৃহৎ পুঁজির আনুকুল্যে চলা মাসমিড়িয়াও সমাজে এই মইণ্ডসেট গড়ার সহায়ক হয়। যে পদ্ধটিকে নোয়াম চমস্কি অভিহিত করেছেন 'Manufacturing consent' বলে। ইতিহাস দেখিয়েছে যে, স্বৈরতন্ত্রী প্রশাসনের পরিপুরক হচ্ছে লুণ্ঠনধর্মী অর্থনীতি। ৩৪ বছরের আলিমুদ্দিন শাসনের অভিজ্ঞতাও একই কথা বলছে। দীর্ঘকাল ধরে সরকার ও প্রশাসনসহ ক্ষমতার সব অক্ষই মাস্তান,দালাল, প্রোমোটার ও কর্পোরেট লবির করায়ত্ব ছিল। রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিটি ধমনীইছিল এদের প্রবল উপস্থিতি। পুরানো সরকারের ছত্রছায়া ছেড়ে এরা কব্জা করতে চায় সাধারণের এই সরকারকে। জনগণের এই দলটাকে। ক্ষমতার অলিন্দে এরা রয়েই গিয়েছে। পুলিশ-আমলা-মাস্তান-প্রোমেটার-বেওসাদার- কর্পোরেট-মাধ্যসত্বভোগী-ফাউ-মাতব্বর মিলে এরা সবাই গিলতে চায় সরকার ও দলটাকে। এদের পথকে মসৃণ করে দেওয়ার কাজে নিতে হবে মিডিয়ার একাংশের অর্কস্ট্রেটেড কীর্তন-কোরাস। সেখানেই কামান দেগেছে মা-মাটি-মানুষের সরকার। আজও গড়তে দেওয়া হয়নি এসইজেড। রুদ্ধ রয়েছে জিএম বীজের ব্যবহার। পিছিয়ে গেছে খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশী পুঁজি লগ্নি ঢোকানোর চক্রীরা। থমকেছে এনসিটিসি। স্তব্ধ রয়েছে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের মারণখেলা। আস্তাকুড়ে চলে গিয়েছে ১৮৯৪- র জমি অধিগ্রহণের কালাকানুন। ফেরৎ পাচ্ছে জমি সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক চাষী। বন্ধ রয়েছে জঙ্গালমহল-পাহাড়ের রক্তক্ষরণ। হচ্ছে না দলতন্ত্রের মুখোশে হার্মাদ মাতব্বরির ও মাওবাদীরূপ নৈরাজ্যের। পাইক বরকন্দাজরাও শিখেছে ধীরেধীরে মানুষের প্রভু না হতে। আবার টেফলন বুদ্ধিজীবি ও এস্টাবলিশমেন্ট মিডিয়ার ডটেড লাইনেও সরকার চলছে না। সদর দপ্তরে দাঁড়িয়েই, স্থিবস্থার ঘুণপোকারদের সমেত ক্ষমতার তথাকথিত অলিন্দটাকেই ভাঙতে রক্তকরবীর নন্দিনী আর রাজা মিলেমিশে যেন একাকার হয়ে ভাঙছে গড়ছে বদল আনছে।

আর রাজনীতির বৃহত্তর যে দিন। সেটাও তো এইটাই। রাজনীতির লক্ষ্য ব্যক্তির মুক্তি। কারণ মানুষের মুক্তি সামাজিকভাবে ও ব্যক্তিসত্ত্বার অস্তিতে চূড়ান্ত অন্বষ্ট, যা মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে আবহমানকাল সংশ্লষ্ট। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে পুরানো সমাধানগুলো আজসম্পূর্ণবলে আজ প্রমাণিত। বিংশ শতাব্দীতে মার্কসের চিন্তাধারার মধ্যেই মানুষ সন্ধান করেছে মানবমুক্তির পথ। এর ফলিত রূপ সোভিয়েত ব্যবস্থা দেখিয়েছে মানবমুক্তির দূরের কথা, সর্বহারার একনায়কত্বের নামে এই পার্টিডিক্টেরশিপে মানুষ আরও বেশি শৃঙ্খলিত হয়েছেন। আবার স্বৈরাচারকে সংঘাত করার জন্য যে সংসদীয় গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে, তার সীমাবদ্ধতাও আজ প্রকট রূপে প্রতিভাত। কারণ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম লক্ষ্য যদি শুধু ক্ষমতাদখল হয়, তাহলে সেটি হয় কেবল শাসন পরিবর্তনের লড়ই- শাসক হওয়ার লড়াই। সেটি কখনই সমাজ বদলের লড়াই হয়ে ওঠে না। তাই শুধু শাসক বদলে নয়, শাসন প্রকরণ বদলেও নয়, পরিবর্তন আনার লড়াই চলছে। মানুষ নিজে থেকেই যে জীবনধারাকে মেনে নেয়, প্রচারযন্ত্রের (মাসমিডিয়া) কল্যাণে ভাবতে শেখে এর বিকল্প নেই, সেখানেও বদল আনার জারি হায়ছে। এর শেষটা কোথায় কেউ জানে না, নন্দিনী জানে - রাজা জানে - দুজন মিলেই হয়তো জানে - কোন খ্যাপামির তালে নামে পাগল সাগর নীর/ সেই তালে যে পা ফেলে য়াই, রইতে নারি স্থির।